একটি লাল নোটবুক

মাহিন মাহমুদ

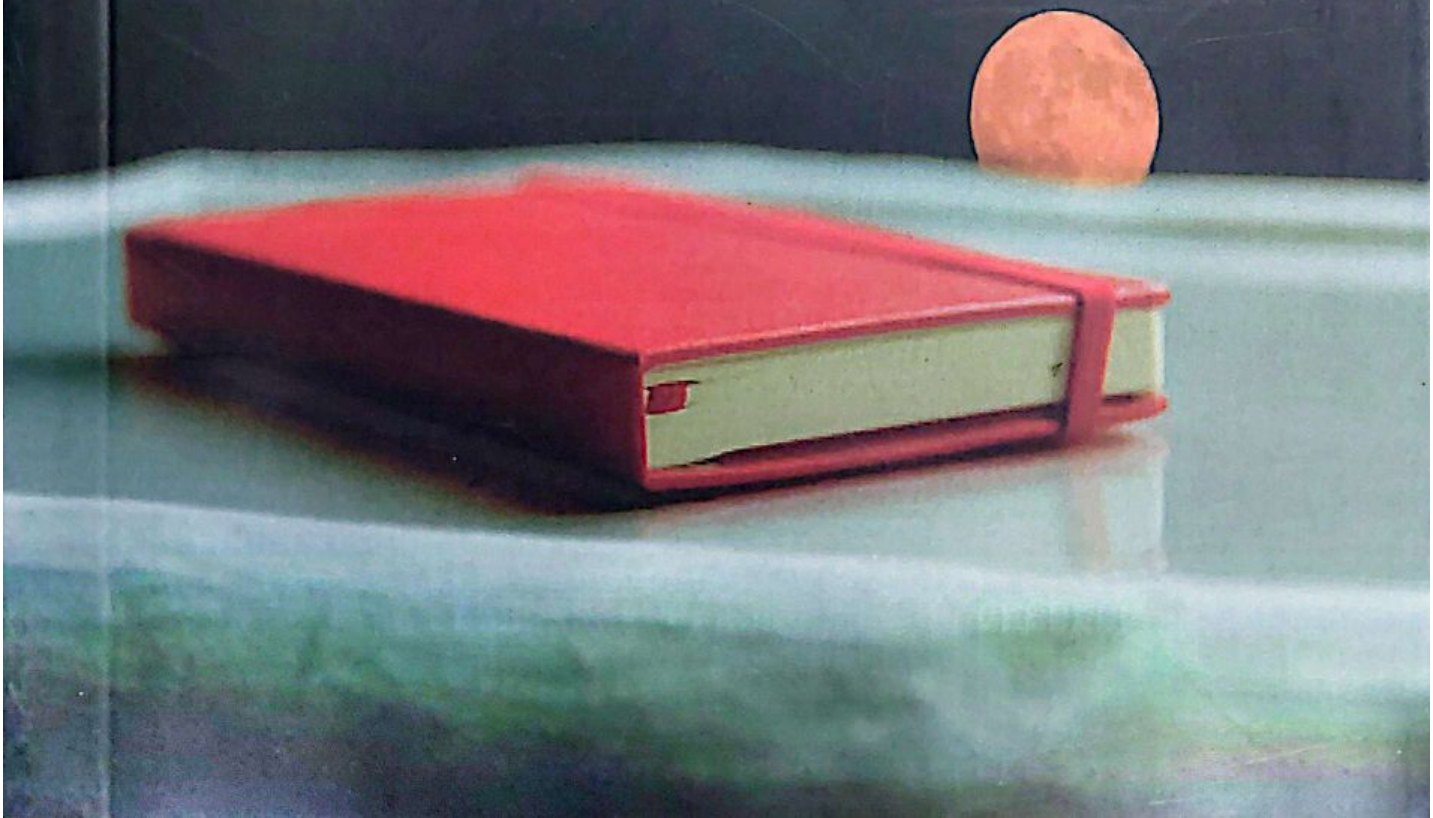

লেখক পরিচিতি

ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার হিসেবে মাহিন মাহমুদ এই সময়ের একটি পাঠকপ্রিয় নাম। গ্রামীণ পরিবেশের রূপ, রং এবং সৌন্দর্য গায়ে মেখে তার বেড়ে ওঠা। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনোর সূচনা। এরপর বাবার ব্যবসার সুবাদে শহরমুখো হওয়া এবং মাদরাসাশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া।

তিনি ভালোবাসেন স্বপ্ন দেখতে। স্বপ্ন দেখেন সুন্দর একটি দেশের। যে দেশের মানুষগুলোর চিন্তা-চেতনা হবে প্রকৃতির মতোই সুন্দর এবং মায়াময়।

কিন্তু, সমাজের চিত্র এর ব্যতিক্রম। এ চিত্র তাকে ব্যথিত করে। ব্যাকুল করে হৃদয়। তবুও তার স্বপ্ন-সমাজ একদিন বদলাবেই। দিন বদলের স্বপ্ন নিয়েই তিনি কলম চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজের কাছে দসে বার্তা তিনি পৌঁছাতেও পেরেছেন। 'আঁধার মানবী', 'শেষ চিঠি', 'একটি লাল নোটবুক', 'পুণ্যময়ী', 'প্রাসাদপুত্র', 'প্রাসাদপুত্র-২'-এর মতো ছয়-ছয়টি সুখপাঠ্য উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন আত্মপরিচর্যামূলক গল্পগ্রন্থ-'কাল থেকে ভালো হয়ে যাব'।

বইগুলোর অবস্থান এখন পাঠকপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে। লেখনীর মাধ্যমে তিনি পেরেছেন সমাজের বাস্তব চিত্র অত্যন্ত সফলতার সাথে তুলে ধরতে। ফেসবুক আর ইউটিউবে আকৃষ্ট যুবসমাজকে তিনি পেরেছেন বইপাঠের প্রতি উৎসাহিত করতে।

দ্বীনের প্রসার এবং সুন্দর, সুশোভিত সমাজ বিনির্মাণে তার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। আমরা লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

মাসুম বিল্লাহ
শিক্ষক
জামিআতুল আজিজ আল ইসলামিয়া
(ঢাকা উদ্যান), মোহাম্মদপুর, ঢাকা

৯-১

'আমি কি এখানটায় বসতে পারি?'

মারুফ একপাশে সরে গিয়ে বলল, 'জ্বী, বসুন।'

'একটু যদি জানালার পাশের সিটটায় আমাকে দিতেন, ভালো হতো। দূরপাল্লার জার্নিতে আমার একটু সমস্যা হয়। বমি বমি লাগে।'

মারুফ ইতস্তত করল। বাসে জানালার পাশে না বসলে তারও সমস্যা হয়। মাথা ঘোরায়। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে ওঠে। তা ছাড়া, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মা পইপই করে বলে দিয়েছেন, 'জানালার পাশের সিট ছাড়া বসবি না। হাত এবং মাথা জানালার বাইরে বের করবি না। ফেরিওয়ালাদের থেকে কোনো কিছু কিনে খাবি না, মনে থাকবে তো?'

'জ্বী মা, থাকবে।'

'শুধু ফেরিওয়ালা না, যাত্রীরা কেউ কিছু দিলেও খাবি না।'

'আচ্ছা।'

'টাকা-পয়সা সাবধানে রাখবি, কারও সামনে মানিব্যাগ খুলবি না, ভাড়ার টাকা আগেই আলাদা করে রাখ।'

'আচ্ছা মা, রাখব।'

'রাখব না, এখনই আলাদা কর।'

'এই, করলাম।'

'মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। পড়াশোনা ছাড়া আর কোনো কিছুতে মনোযোগ দিবি না। জানি তুই আমার তেমন ছেলেই না, তবুও, দেশের পরিস্থিতি ভালো না, তাই বললাম। সময়মতো ঘুম, গোসল, খাওয়া-দাওয়া করবি, কেমন?'

'জ্বী আচ্ছা, করব মা।'

'এইবার যা বাবা। ফী আমানিল্লাহ... আর শোন!'

মারুফ হেসে ফেলে বলল, মা, দেরি হয়ে যাচ্ছে! গাড়ি পাব না শেষে!'

মনোয়ারা ভেজা চোখে ছেলেকে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, ঢাকায় গিয়েই মাকে ফোন করবি, মনে থাকবে তো?'

'জ্বী, থাকবে।'

মারুফের সবই মনে আছে। কিন্তু বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। সে কি জানালার পাশের সিটটা ছেড়ে দেবে, নাকি ঝিম মেরে বসে থাকবে। নাকি বলেই ফেলবে, আমি জানালার পাশের সিট ছাড়তে পারব না, আপনি এই সিটেই বসুন।

'কিছু বলছেন না যে?'

মেয়েটা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মারুফের পক্ষে ঝিম মেরে বসে থাকা সম্ভব হলো না। সে এতটা স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন না যে, কেউ তার কাছে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবে না। তার এই পঁচিশ বছর বয়সেও মা এখনো তাকে যতই বোকাসোকা এবং ছেলেমানুষ ভাবুক, এই ভদ্রতাবোধটুকু তার আছে। সিটটা ছেড়ে দেয়াই উচিত। কয়েক ঘণ্টারই তো জার্নি। একটু না হয় মাথা ঘোরালো, পেট গুলাল ক্ষতি কি তাতে? অন্য একজনের উপকার তো হচ্ছে!

মারুফ জানালার পাশের সিটটা ছেড়ে দিয়ে সরে বসল। মেয়েটা একরাশ কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ'।

ফরমালিটিবশত মারুফের বলা উচিত—না, ঠিক আছে, ওয়েলকাম। কিন্তু সেটা সে বলতে পারছে না। এ ব্যাপারে মারুফ বরাবরই বিফল। ফরমালিটিটা তাকে দিয়ে হয় না। কেমন যেন জড়তা কাজ করে। মেয়েদের সামনে তো আরও বেশি। জড়তা যেন অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরে!

মেয়েটা জানালাটা ভালো করে খুলে দিয়ে আরাম করে বসল। ক্লান্ত হাতে ব্যাগ থেকে পানির বোতল বের করে পানি খেল। এরপর বলল, 'আপনি ঢাকায় কোথায় যাবেন? সিলেটে থাকেন কোথায়?'

মারুফের অক্টোপাসটা চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। এখন আছে আঁকড়ে ধরবে টাইপ অবস্থায়। 'আপনি কি মাদ্রাসায় পড়েন?'

মারুফের দৃষ্টি সামনের রাস্তার দিকে। সে দৃষ্টিটা বড়জোর রাস্তা থেকে সরিয়ে ড্রাইভারের মাথা পর্যন্ত আনতে পারল। ছোট্ট শব্দে বলল, 'জ্বী।'

'আপনি এভাবে শক্ত হয়ে বসে আছেন কেন? স্বাভাবিক হয়ে বসুন! আমি কি আপনাকে অসুবিধায় ফেলে দিলাম?'

'অসুবিধায় ফেলবেন কেন? দুটি সিটের একটা তো খালিই ছিল। কাউকে না-কাউকে বসতেই হতো। আপনি বসেছেন, এতে অসুবিধার কী আছে?'

কথাটা মারুফ সশব্দে বলেনি। সশব্দে বলতে পারলে তো হয়েই যেত। বলেছে নিঃশব্দে, মনে মনে। 'আপনি কি বিব্রতবোধ করছেন? কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে?'

এই কথায় মারুফ আরও জড়সড় হয়ে গেল। মেজাজ খারাপও হলো কিছুটা। মেয়েটা একটার পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে। এত কথা বলার কী দরকার? চুপচাপ বসে থাকলে কী হয়? এই জন্যই বুঝি বন্ধুরা বলে, মেয়েদের পক্ষে চুপচাপ থাকা, আর আগুনে হাত রাখা সমান কষ্টের।

২

মারুফ এই মুহূর্তে একটা মোবাইল ফোনের অভাব অনুভব করছে। মোবাইল ফোন থাকলে ভালো হতো। হেডফোন কানে গুঁজে দিয়ে তিলাওয়াত শোনা যেত। এতে লাভ হতো দুটি। নিজেকে স্বাভাবিকও করা যেত, আবার মেয়েটার কথাও কানে নিতে হতো না। তা ছাড়া, আমলনামায় সওয়াব যোগ হওয়ার বিষয়টা তো আছেই।

মারুফের মোবাইল ফোন যে নেই তা নয়; আছে। বড় মামা সৌদি থেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেটা ব্যবহার করা হয় বাড়িতে এলে, কালে-ভদ্রে। মোবাইলের পেছনে পড়ে থাকলে পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে সেটা কখনোই মাদ্রাসায় নেয়া হয় না।

এই যুগের এক যুবক ছেলের হাতে মোবাইল ফোন নেই, বিষয়টা একটু অবাক করার মতোই। বাড়িতে গেলে পরিচিত অনেকেই ফোন নম্বর জানতে চায়। মারুফ ইচ্ছে করেই নম্বর দেয় না। দিয়ে লাভ কী? কদিনই-বা বাড়িতে থাকা হয় তার?

পাড়ার সমবয়সীরা ব্যাকডেটেট, বুরবাক বলে খ্যাপায়। মারুফ এসব গায়ে মাখে না। ওর কাছে পড়াশোনাটাই সব। কে কী বলল তাতে ওর কিচ্ছু যায় আসে না।

মেয়েটা পার্স থেকে ফোন বের করে কাকে যেন ফোন করল। প্রায় ফিসফিস শব্দে কথা বললেও কিছু কিছু কথা বোঝা যাচ্ছে। 'ভাবি! আমি নাবিলা বলছি, আমার কণ্ঠ চিনতে পারছ না?... হ্যাঁ হ্যাঁ! এই তো অনেকক্ষণ হয়েছে গাড়িতে উঠেছি।... জানো ভাবি! জানালার পাশে সিট পাচ্ছিলাম না, একজন মহানুভব ব্যক্তি তার সিট আমার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন।... নাহ্, কী বলছ?... ছেলেটাকে মোটেও বাজে লোক বলে মনে হচ্ছে না। তবে, একটু লাজুক টাইপের। মাদ্রাসার ছাত্ররা তো!'...

তো কঠিন কাজ না। ওড়নামাথা মেয়েদের দেখতে কতটা ভালো লাগে এটা বোধহয় তারা নিজেরাও জানে না। মারুফের পাশে বসা এই মেয়েটাও এতক্ষণ খালি মাথায় ছিল। বাতাসের কারণে হলেও ওড়নাটা সে মাথায় দিয়েছে। তাকেও নিশ্চয়ই এখন ভালো দেখাচ্ছে! মারুফ এই পর্যন্ত মেয়েটার দিকে ভালো করে একবারও তাকায়নি। তাকালে বিষয়টা বোঝা যেত।

মেয়েটা দেখতে কেমন সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও বোধ করছে না মারুফ। 'চুলবৃষ্টি'র ঝাপটা থেকে আপাতত বাঁচা গেছে এতেই ওর স্বস্তি।

মারুফ বলল, 'ধন্যবাদ।'

এবার নিঃশব্দে না। মারুফ নিজেই অবাক হলো। ধন্যবাদটা সে সশব্দে দিতে পেরেছে! মেয়েটাও কি কিছুটা অবাক হলো? হবে হয়তো। মারুফ অনুভব করল, পর পর দুবার মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়েছে।

মারুফের সেদিকে মনোযোগ নেই। সে ভাবছে অন্য কথা। মায়ের শরীরটা বেশি ভালো নেই। দীর্ঘদিন হলো ডায়াবেটিসে ভুগছেন। কোমর ব্যথার সমস্যাটাও দিন দিন বাড়ছে। আল্লাহই জানেন, কতদিন আর মাকে কাছে পাওয়া যাবে। মা তাকে অনেক ভালোবাসে। সেও ভালোবাসে মাকে। শ্রদ্ধাও করে অনেক। পৃথিবীতে মায়ের মতন আপন আর কেই-বা আছে?

মারুফের বয়স তখন দশ। হঠাৎ করে বাবা চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। স্কুলমাস্টার বাবাই ছিলেন ওর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। বাবার সঙ্গে ঘুমানো, পুকুরে গোসল করতে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া-আসা করা—সবই হতো। খাওয়ার সময় গভীর মমতায় ভাত মেখে খাইয়ে দিতেন বাবা। এমনকি গোসল শেষে শরীরে খাঁটি সরিষার তেল মেখে দেয়ার কাজটাও বাবাই করতেন। কী অপূর্ব ছিল সেই ভালোবাসা!

বাবা চলে যাওয়ার পর মারুফ সম্পূর্ণ একা হয়ে গেল। বড় দু-বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আগেই। একজনের নাম নাজিয়া, অন্যজন মারজিয়া। বোনদের সঙ্গে ওর তেমন জমত না। এর জন্যও ওই লাজুকতাই দায়ী। মা বলতেন, 'নাজিয়া-মারজিয়া তোর আপন বোন। ওদেরও কেন লজ্জা পাস বল তো? মেয়েমানুষও তো তোর মতো এতটা লাজুক না! তোকে নিয়ে আমি আছি ভীষণ চিন্তায়। তোর ভবিষ্যৎ যে কী হবে, আল্লাহই জানেন।'

বোনেরা হেসে বলল, 'মা, ওর যা অবস্থা! স্কুল-কলেজে ওকে দিয়ে পড়াশোনা হবে না। ওকে বরং মাদ্রাসায় দিয়ে দাও। সেখানে মেয়েও নেই, সারাক্ষণ লজ্জায় মরে যাবার কোনো ঝামেলাও নেই।'